ভোরের কাগজ
ভোরের কাগজ

তারিখ ... 11 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪ ...

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস: ভাবনা ও প্রস্তাবনা

নূরুর রহমান খান

কোনো বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি রুচিকর হওয়ার কথা নয়। তবু এমন ঘটনা–দুর্ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে যেগুলো সম্পর্কে বারংবার কথা বলা উচিত, লেখা উচিত। সকলের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে– অনেক সময় অপ্রিয় হলেও– নির্ভীক উচ্চারণ এবং ব্যক্তিজীবনে তার অনুশীলন, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক জীবনে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সৎ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই ঈমানের অঙ্গ। নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র লোভ–মোহ পরিহার করে কিংবা চিত্তদৌর্বল্যের উর্ধ্বে থেকে সত্যকে তুলে ধরতে হবে আমাদেরই স্বার্থে, বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে।

বাংলাদেশের জন্য বর্তমান মুহূর্তের মূর্তিমান অভিশাপ সন্ত্রাস। অতীতের কলেরা–বসন্ত–মন্বন্তর এমনকি পাকিস্তানী বর্বরতার চেয়েও ভয়াল মূর্তিতে সন্ত্রাস জাতির বুকে বিষাক্ত নখর প্রোথিত করেছে– তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংক্রমিত। বিভিন্ন রূপে এই 'গজব' আবির্ভূত হয়। কখনো তারা আসে 'উর্দি' পরে, আবার কখনোবা সাদা পোশাকে। উর্দিওয়ালাদের হাতে খুন হয়েছেন শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের এবং আরো অনেকে। এদেরই প্রতিনিধি এরশাদ রাষ্ট্রপতি সাত্তারের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ক্ষমতা হাইজ্যাক করেছিল। চাঁদাবাজি–রাহাজানি–ছিনতাইয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের হাতেখড়ি। তারপর রগকাটা–গলাকাটায় পারদর্শী হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠিত নেতার ছত্রচ্ছায়ায় 'ভবিষ্যৎ নেতা' হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে এরা নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে। এভাবেই খোকা–পাঁচপাত্তু–অভি–ইমদু–কাশেমদের উত্থান। এদের অনেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করে। খুনের আসামী হয়ে দেশত্যাগী হয়। আত্মস্বীকৃত খুনীরা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হয় কিংবা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজনৈতিক মঞ্চ সরগরম রাখে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলার জন্যই দীর্ঘ এ গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা। অপ্রিয় কথনের পূর্বে বিভাগোত্তরকালে ১৯৪৮ থেকে '৯০ পর্যন্ত ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়–অবিচার প্রতিরোধে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে তারুণ্যের প্রতিভূ এ দেশের ছাত্রসমাজের অগ্রণী ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্মরণ করতে হয় জেহাদ–নূর হোসেনদের– যাদের পবিত্র রক্তের সিঁড়ি বেয়ে আজকের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রবিরোধী দলের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

আমরা আশাহত হয়ে আবার ভরসায় বুক বাঁধি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বৈরাচারের অপছায়া যে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে আমাদের তাড়া করছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় ছাত্রত্বের মুখোশ এঁটে কিংবা ছাত্রদের ব্যবহার করে এই দুর্বৃত্তের দল তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করছে আর কলঙ্কের কালিমায় নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে ছাত্রসমাজের গৌরবান্বিত অতীত ও অর্জনকে। ছাত্ররা ব্যবহৃত হচ্ছে দুশ্চরিত্র রাজনীতিক–ব্যবসায়ী–ক্ষমতালিপ্সুদের হাতিয়ার হিসেবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘটছে খুন–জখম এবং নানাবিধ অনভিপ্রেত ঘটনা। এরশাদের নয় বছর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার এবং বিরোধী দল। দেশের অগ্রগতির কৃতিত্বের সিংহভাগের দাবিদার যেমন ক্ষমতাসীন দল, তেমনি সঙ্গত কারণেই ব্যর্থতার দায়–দায়িত্ব এবং গ্লানিও বহন করতে হবে তাদেরই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলও কিছুতেই নিজেদের বিযুক্ত রাখতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নতি–অবনতিতে উভয়ের ভূমিকাই সমগুরুত্বপূর্ণ। জনতার সম্মুখে উভয় দলই তাদের [illegible] নৈতিকভাবে বাধ্য। কারণ, সাধারণের ভোটেই তাদের কেউ ক্ষমতাসীন আবার কেউ বিরোধী দলের সম্মানিত আসনে সমাসীন।

বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একশ্রেণীর দুর্বৃত্তের সদম্ভ পদচারণায় প্রকম্পিত। অতি সম্প্রতি এদের আলামত অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিবিরের হামলায় মৃত্যুবরণ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিমু। আহত অসংখ্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন থেকেই শিবিরের একাধিপত্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কেও তারা মোটামুটি নিজেদের কব্জায় এনেছে। অবশ্য এর পশ্চাতে অদৃশ্য সরকারি 'কজী' অত্যন্ত সক্রিয়। মরহুম জিয়া যে ফ্যাক্টরি থেকে শাহ্ আজিজ, শামসুল হুদা চৌধুরী, মওলানা মান্নান–আলিমদের আমদানি করেছিলেন, সেই একই ভাণ্ডারের কিছু 'অমূল্য রত্ন' বেগম জিয়াও পেয়েছেন। তাদেরই আশীর্বাদসিক্ত গোষ্ঠী চট্টগ্রাম–রাজশাহী–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনে দিনে তেজীয়ান হয়ে উঠেছে। জাহাঙ্গীরনগরের 'উপদ্রব' তারই দলের কোনো কোনো সদস্যের প্রত্যক্ষ মদদ ও পরিচালনায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে– যার ন্যক্কারজনক প্রকাশ ঘটেছে গত ২৯ জুলাই, '৯৩ তারিখে। প্রকাশ্য দিবালোকে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা চড়াও হয়েছে তাদেরই শিক্ষকদের ওপর, প্রহার করেছে নির্মমভাবে। এই সন্ত্রাসীদের ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসের পশ্চাতেও কাজ করেছে ক্ষমতাসীনদের 'অদৃশ্য কজী'। এরা সরকারি দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের নেতা–কর্মী ও সদস্য। পূর্বেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ অপকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের কারো কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সরকারি দলের কালো হাত। জনৈক মন্ত্রী একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে অত্যন্ত উলঙ্গভাবে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছেন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে। ক্ষমতাসীনদের সিঞ্চিত জলেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের অঙ্কুর এখন বিশাল মহীরুহে পরিণতি লাভ করেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের সহযোগে ছাত্রদলের বর্বরতা সমগ্র জাতিকে স্তম্ভিত করেছে, সভ্য সমাজে আমাদের মাথা হেঁট করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নারকীয় তাণ্ডবের পর বাধ্য হয়ে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন' বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তারই দলের অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের কীর্তিকলাপের বিশদ বিবরণ সংবলিত একটি 'স্মারকলিপি' প্রদান করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্মারকলিপিটির মর্মার্থ এবং দু–একটি দৈনিকে লিপিটি হুবহু প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্র–রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের কতোজন প্রকৃত শিক্ষার্থী। বিশেষ করে, যারা নেতৃত্বে রয়েছে তাদের বয়স ৩৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। চল্লিশোর্ধ্বের সাক্ষাৎ লাভও অস্বাভাবিক নয়। সন্ত্রাসী মুখ অতি পরিচিত। জিন্নাহর হত্যাকাণ্ডে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপির উর্ধ্বতন মহল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হন। ৪ নভেম্বরে দৈনিক [illegible] সংবাদে প্রকাশ, 'সুগন্ধা' থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ছাত্রদল নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে টেন্ডার ব্যবসা করলে দল থেকে বহিষ্কার' করা হবে। একইসঙ্গে 'ইতিপূর্বে যারা অস্ত্রের সংস্পর্শে এসেছে' তাদের প্রতিও 'সাবধান বাণী' উচ্চারিত হয়। সুতরাং অস্ত্রধারীরা যে সুচিহ্নিত এবং ক্ষমতাসীন দল যে তা অবহিত– নির্দ্বিধায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

গত ৫ নভেম্বর তারিখে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করতে বলেন। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগে বহিষ্কৃত দুষ্কৃতকারীরা ছাত্র না হয়েও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে। অন্যান্য দলও সন্ত্রাসীদের দলছাড়া করতে অনীহ। এমনি অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হতে শঙ্কিতচিত্ত। দলীয় আশ্রয় এবং প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে এরা কতো দুর্বিনীত আচরণ করতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান তা হাড়ে–মাংসে টের পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নাকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সন্ত্রাসীদের তালিকা চেয়েছেন। এই সংবাদটি উদ্ভট এবং হাস্যকর। শিক্ষকরা পঠন–পাঠনের সঙ্গে যুক্ত। সন্ত্রাসীদের সন্ধান রাখা ও তাদের দমন, আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জানমালের হেফাজতের দায়িত্ব সরকারের। এ জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও বিরাট বাহিনী রয়েছে। ইতিপূর্বেও সন্ত্রাসীদের তালিকার কথা পত্রপত্রিকায় এসেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে না চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা পুলিশের আইজি অথবা গোয়েন্দা বিভাগের কাছেই প্রধানমন্ত্রী তার প্রার্থিত তালিকা পেতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে তার দলের রথী–মহারথী তথা মন্ত্রীদের কাছেও এই তালিকা চাইতে পারেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোন নেতা কতোজন সন্ত্রাসীর সরদার সে সংবাদ পুলিশের নখদর্পণেই রয়েছে। কাজেই সন্ত্রাস দমন কিংবা শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে যদি প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আন্তরিক হন, তাহলে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে সন্ত্রাসের শেকড় সমূলে উৎপাটন সম্ভব।

দীর্ঘ আলোচনার উপান্তে এসে বলা যায়, সততা, সদিচ্ছা এবং দেশপ্রেমের অনির্বাণ অনুভূতিই আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারে। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, সংকীর্ণ দলীয় কর্মকাণ্ডের বলয় থেকে মুক্তি পেলেই সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। এজন্য অপরিহার্য চরিত্রশক্তি এবং দেশবাসীর আস্থা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, স্বাধীনতা–পরবর্তীকালে কোনো সরকারই চরিত্রশক্তির পরিচয় দান করতে পারেননি, ফলে দেশবাসীর আস্থা অর্জনেও হয়েছেন [illegible]। প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে দলীয় স্বার্থে [illegible] করেছেন– জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা করেছেন পদদলিত। ক্ষমতায় রয়েই [illegible] প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা। তাদের রাতারাতি ফুলে–ফেঁপে ওঠা অবস্থাও জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। নেতৃত্বদান করতে হলে তার পূর্বশর্ত পূরণকল্পে নেতৃত্বকামীদের চরিত্র সংশোধন করতে হবে, গণমানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। এর জন্য মুখের ভাষাকে বুকের ভাষা করা চাই। সৎ এবং চরিত্রবান নেতার অভাব এদেশে প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে। যারা নেতৃত্বদান করছেন, ক্ষমতায় রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদের মন–মানসিকতার পরিবর্তন এবং চরিত্র সংশোধন ব্যতিরেকে সন্ত্রাস কিংবা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্তি নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, বিরোধী দলকেও প্রসারিত করতে হবে সহযোগিতার হস্ত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করে বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব :

১. কোনো অছাত্র ছাত্র সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না এবং ছাত্র রাজনীতিতে তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

২. অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর কাউকে আর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে গণ্য করা চলবে না।

৩. ছাত্রত্ব না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, হল কিংবা কলেজের ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা হিসেবে কেউ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

৪. নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে পরবর্তী নির্বাচন হোক বা না হোক বিশ্ববিদ্যালয়, হল কিংবা কলেজের ছাত্র সংসদ বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

৫. ছাত্রত্বকে 'পেশা' হিসেবে গ্রহণ নিরুৎসাহিত তথা প্রতিহত করার জন্য ২৬ বছর বয়সোর্ধ্বদের ছাত্র সংগঠনের সদস্যপদ বাতিল এবং যে কোনো ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. সন্ত্রাসের অভিযোগে বহিষ্কৃতদের কোনো ছাত্র সংগঠনে রাখা কিংবা আশ্রয়দান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭. দলীয় আনুগত্য বিবেচনায় না এনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবেই চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীন যে কোনো নির্মাণকার্য, পরিবহন, দ্রব্যাদি সরবরাহ কিংবা অন্য কোনো অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ছাত্র সম্পর্কিত থাকতে পারবে না।

৯. সকল ছাত্রনেতার অর্জিত অর্থের পরিমাণ ও উপার্জনের উৎস প্রকাশ করতে হবে।

১০. ক) পুলিশ বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার সম্পূর্ণ রহিত এবং পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে হবে।

খ) পেশাগত সততা এবং নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের যেন কারো রোষানলে পড়তে এবং কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার না হতে হয়– তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত কোনো সভা–সমাবেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে হবে।

বিভেদ নয়, ঐক্যের মধ্যেই নিহিত আমাদের মুক্তি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সংসদেও দেশবাসী নির্বাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে সর্বদলীয় ঐতিহাসিক ঐক্য। বেতন–ভাতা বৃদ্ধি, শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি, সাংসদদের পেনশন ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচিত সাংসদরা যে ঐক্যের পরিচয় দিয়েছেন, সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তারা কি আরেকবার অনুরূপ ঐক্যের নিদর্শন স্থাপন করতে পারবেন না?

ডঃ নূরুর রহমান খান, পিএইচডি, ডি. লিট : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।